চলবে ; আর সেই চাঁদ, যার আলোতে আমরা রাত্তিরে পথ দেখতে পাব। বলা বাহুল্য যে, এদেশে এখন রাত্তির, আর আমরা জাতকে-জাত রাত-কানা।

অতএব কন্‌গ্রেসের পক্ষে জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদ্ হবার পূর্বে জাতীয়-রাজনৈতিক-আদর্শ-অনুসন্ধান-সমিতি হওয়া কর্তব্য।

ইতিমধ্যে আমি একটি আটপৌরে আদর্শ দেশের হাতে ধরে দিতে চাই। আমার কথা এই— এস, আমরা ঘরে বসে নিজের নিজের চরকায় বিলেতি তেল দিই, তা হলেই সকলে মিলে ভারতমাতার চরকায় স্বদেশী তেল দেওয়া হবে এবং তাতে মা আমাদের যে কাটনা কাটবেন, তার সুতো মাকড়সার সুতোর চাইতে সূক্ষ্ম হবে এবং সেই সুতোর জাল বুনে সেই ফাঁদে আমরা আকাশের চাঁদ ধরব।

ফাল্গুন ১৩২২

পত্র ২

শ্রীযুক্ত 'সবুজপত্র'সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আবিষ্কার করেছেন যে, এদেশে মাসিকপত্রের পরমায়ু গড়ে চার বৎসর।

ত্রিবেদীমহাশয় বাংলার একজন অগ্রগণ্য আয়ুর্বেদী, ইংরেজিতে যাকে বলে বায়োলজিস্ট— অতএব আয়ু সম্বন্ধে তাঁর গণনা যে নির্ভুল, একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য।

এই হিসেবে সবুজপত্রের জীবনের মেয়াদ আরও দু বৎসর আছে। এস্থলে বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করা অকর্তব্য মনে করেই সম্ভবত আপনারা সবুজপত্রের পূর্বনির্দিষ্ট মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। এ পত্র যে দু বৎসরের কড়ারে বার করা হয়, সেবিষয়ে আমি সাক্ষি দিতে পারি। কেননা, যেক্ষেত্রে সবুজপত্র প্রকাশ করবার ষড়যন্ত্র করা হয়— মনে রাখবেন হাল আইনে দুজনেও ষড়যন্ত্র হয়— সেক্ষেত্রে আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলুম।

সবুজপত্র আর-এক বৎসর সবুজ থাকবে, এ সংবাদে পাঠকসমাজ খুশি হবেন কি না জানি নে, কিন্তু সমালোচকসম্প্রদায় যে হবেন না— সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কেননা, এঁরা ও-পত্রের রং কিংবা রস, দুয়ের কোনোটিই পছন্দ করেন না। এঁদের মতে সবুজপত্র সাহিত্যের তেজপত্র, যতক্ষণ না তার রং ও রস দুইই লোপ পায় অর্থাৎ যতক্ষণ না তা শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ তা বাঙালি পুরুষের মুখরোচকও হবে না, বঙ্গরমণীর গৃহস্থালির কাজেও লাগবে না। সবুজপত্র তেজপত্র কি না জানি নে— কিন্তু তা যে নিস্তেজ পত্র নয়, তার প্রমাণ উত্তেজিত সমালোচনায় নিত্যই পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, সবুজপত্রের বেঁচে থাকবার কিংবা ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার আবশ্যকতাই বা কি আর সার্থকতাই বা কোথায়, তা হলে তার কোনো উত্তর দেবেন না। কেননা, ও প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

এ পৃথিবীতে বাঁচবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে কোনোরূপ যুক্তি নেই; অপর-পক্ষে মরবার এবং মারবার পক্ষে এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে যে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শাস্ত্রই মানুষকে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে শিক্ষা দেয়; যে চিন্তার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে নি, তাকে আমরা গভীরও বলি নে, উচ্চও বলি নে। এ জড়বিশ্বের অন্তরে প্রাণ-জিনিসটি প্রক্ষিপ্ত। দর্শন-

বিজ্ঞানের পাকা-খাতায় প্রাণের অঙ্কটা একেবারেই ফাজিল, সুতরাং এ অঙ্কটা বেড়ে গেলে দুনিয়ার জ্ঞানের হিসেবটা আগাগোড়া গরমিল হয়ে যাবে। অতএব যতদিন প্রাণের বিলয় না হয়, ততদিন একটা প্রলয়ের সম্ভাবনা থেকে যাবে। বিশ্বের সম্বন্ধে যা সত্য, সমাজের সম্বন্ধেও তাই সত্য ; কেননা, যাকে আমরা মানবসমাজ বলি, সে তো জীবজগতের একটি অংশমাত্র এবং জীবজগৎ এই জড়জগতের একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। সুতরাং একাগ্রমনে মৃত্যুর চর্চা করাতেই মানুষে তার সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। হত্যা করবার সপক্ষে কত হিতকর এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি আছে, তার পরিচয় বর্তমান জার্মানির সামরিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেদেশে যদি কেউ বলেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম, তা হলে তাঁর কথা সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, এদেশে যদি কেউ বলেন 'স্বহিংসা পরম অধর্ম' তা হলে তাঁর কথাও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপে গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেহের মত আমাদের মনের মধ্যেও প্রাণ আছে। কারণ দেহ-মন একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। সৃষ্টিকে যদি কেউ উলটে ফেলতে পারেন, তা হলে দেখতে পাবেন যে, তখন মন হবে বহির্জগৎ আর দেহ হবে অন্তর্জগৎ। বিশ্বটাকে উলটো করে পড়বার চেষ্টা যে অতিবুদ্ধিমান লোকে নিত্যই করে থাকে, তার প্রমাণ দেশী ও বিদেশী দর্শনে নিত্যই পাওয়া যায়। সে যাই হোক, প্রাণ যে মানুষের অন্তরে আছে শুধু তাই নয়, ও-বস্তু অন্য কোথায়ও নেই ; বাহিরে যা আছে, সে শুধু প্রাণের লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। যে বস্তুর প্রাণ আছে, তা মৃত্যুর অধীন। সুতরাং মনোজগতেও আমরা হত্যা এবং আত্মহত্যা দুইই করতে পারি এবং করেও থাকি। মনোজগতে মারবার যন্ত্রও কথা, আর বাঁচবার মন্ত্রও কথা। দেশকালপাত্রভেদে কেউ-বা কথার রুপোর কাঠি কেউ-বা তার সোনার কাঠি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ রাজ্যেও জীবনের স্বপক্ষে কিছু বলবার নেই, কারণ এখানেও যত সুযুক্তি সব মরণকে বরণ করেছে। সত্যকথা বলতে গেলে, প্রাণের বিরুদ্ধে মানুষের ঢের নালিশ আছে। প্রথমত, প্রাণের ধর্মই হচ্ছে জগতের শান্তি ভঙ্গ করা। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চভূতের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করে এ পৃথিবীতে গাছপালা ফুলফল জীবজন্তু প্রভৃতি যা-কিছু সৃষ্টি করেছে, সে সবই পরিবর্তনশীল ; প্রতি মুহূর্তেই সেসকলের ভিতরবার দুয়েরই কিছু-না-কিছু বদল হচ্ছে। যার ভিতর স্থিতি নেই তার ভিতর উন্নতি থাকতে পারে, কিন্তু শান্তি নেই। দ্বিতীয়ত, এ পৃথিবীতে প্রাণ যে শুধু প্রক্ষিপ্ত তাই নয়, তা ঈষৎ ক্ষিপ্তও বটে। জড়বস্তু যেভাবে জড়জগতের নিয়ম মেনে চলে, প্রাণ প্রাণীর হাতে-গড়া বাগ সেভাবে মানে না। প্রাণ নিত্য নূতন আকারে দেখা দেয়, প্রাণের

প্রতিমূর্তির ভিতর কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে— পৃথিবীতে এমন দুটি পাতা নেই, যা এক-ছাঁচে ঢালা। ব্যক্তিত্বেই প্রাণীজগতের পরিচয়। তার পর, প্রাণ যত পরিপুষ্ট হয়, তত তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাণকে নষ্ট করা। প্রাণ এতই অবাধ্য ও বেয়াড়া যে, মানুষকে ও-বস্তু নিয়ে দিবারাত্র জ্বালাতন হতে হয়। আসলে ও-বস্তু হচ্ছে জড়জগতের বুকের জ্বালা— যেমন আলো তার গায়ের জ্বালা। এরূপ হবারও কারণ কাছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন আবিষ্কার করেছেন যে, আদিতে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না, কোনো অজানা অতীতের কোনো-এক অশুভ মুহূর্তে কোনো অজানা অতিপৃথিবী থেকে প্রাণ শূন্যপথে উল্কাযোগে মর্তভূমিতে অবতীর্ণ হয়। প্রাণের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই জড়পৃথিবীর অন্তরে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সে আগুন দেশেবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নানা বস্তুর ভিতর দিয়ে নানা আকারে নানা বর্ণে নানা ভঙ্গিতে জ্বলে উঠেছে। জড়জগৎ এ আগুন নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারছে না।

আমাদের মনোজগতে প্রাণ যে কোথা থেকে এল, সে সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অনেকের ধারণা, এদেশে ও-বস্তু বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু ইতিপূর্বেও এদেশে যে প্রাণ ছিল, তার প্রমাণ আছে। আমার বিশ্বাস, কোনো অতিমনোজগৎ থেকে কোনো মানসী-উল্কার স্কন্ধে ভর ক'রে প্রাণ মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যাঁর মনের ভিতর কখনো নূতন প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, তিনিই জানেন যে, সে প্রাণ উল্কার মত আসে ; অর্থাৎ হঠাৎ এসে পড়ে, আর তার দীপ্ত আলোকে সমস্ত মনটাকে উদ্দীপ্ত উত্তপ্ত ক'রে তোলে। গ্যেটে বলেছেন যে, মানুষের মনে নূতন ভালোবাসার সঙ্গেসঙ্গেই নূতন জীবন জন্মলাভ করে। আর ভালোবাসা যে উল্কার মত আমাদের মনের উপর এসে পড়ে, এ সত্য সকলেই জানেন। সুতরাং একটা আকস্মিক উপদ্রবের মত প্রাণের আবির্ভাব হয়। এবিষয়ে হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমধর্মী। এ জগতে আমরা যাকে সত্য বলি, তাও কোনো অজানা দেশ থেকে অকস্মাৎ এসে সমগ্র অন্তর্লোককে আলোকিত করে আবির্ভূত হয়। খড়ি পেতে গণনা করে অদ্যাবধি কোনো দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক কোনো সত্যই আবিষ্কার করতে পারেন নি। এবং যে সত্যের ভিতর প্রাণের আগুন আছে, তা মিথ্যাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খায়। সুতরাং একের আবিষ্কৃত সত্যের জ্বালা বহুলোককে সহ্য করতে হয়। এবং মানবমনের যে অংশ জড়, সে অংশ মনের এই প্রক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত ও দীপ্ত আগুনকে নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি।

মানুষের ভিতরে-বাইরে জড়ের ও প্রাণের অহর্নিশি যে দ্বন্দ্ব চলছে, সে দ্বন্দ্বের তিলমাত্র বিরাম নেই, ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এ যুদ্ধের শেষফল কি দাঁড়াবে, বিশ্বের শেষকথা মৃত্যু কি অমৃতত্ব, সেকথা যাঁর বিশ্ব তিনিই জানেন— তুমিও জান না, আমিও জানি নে। তবে প্রাণের কথা হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আর তার হতাশ হয়ে মাঝপথে শুয়ে পড়বার আজও কোনো কারণ ঘটে নি। কেননা, ক্ষীণ নবীন তৃণাঙ্কুর আজও পৃথিবীর প্রাচীন কঠিন বুক ফুঁড়ে সবুজ হয়ে উঠছে। প্রাণের শক্তি এতই অদম্য যে, এক দেশে তাকে মাটি-চাপা দিলে আর-এক দেশে তা ঠেলে ওঠে, এক যুগে তাকে নিবিয়ে দিলে আর-এক যুগে তা জ্বলে ওঠে।

মনোজগতের এই জীবন-মরণের লড়াইয়ের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নামই সাহিত্য। এক্ষেত্রে কে কোন্ দিক নেবেন, তা তাঁর কোন্ পক্ষের উপর আস্থা বেশি— তার উপর নির্ভর করে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, বাঁচবার আবশ্যকতা কি, এবং বাঁচবার সার্থকতা কোথায়— তা কেউ বলতে পারেন না। তবে যার প্রাণ আছে, তার পক্ষে সেই প্রাণ রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এতই স্বাভাবিক যে, হাজারে ন-শ-নিরানব্বইটি প্রাণী বিনা কারণে প্রাণপণে প্রাণধারণ করতে চায়। প্রাণীমাত্রেরই প্রাণের প্রতি এই অহেতুকী প্রীতিই তার স্থায়িত্বের কারণ। যার এককালে প্রাণ ছিল, তা যে একালে মরেও মরে না— তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আমাদের দেশান্তরে যেতে হয় না।

সুতরাং সবুজপত্র যে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে স্থিরসংকল্প হয়েছে, তার জন্য কোনো প্রাণীর নিকট আপনার কোনোরূপ জবাবদিহি নেই।

বেঁচে থাকবার স্বপক্ষে কোনোরূপ যুক্তি না থাকলেও, তার পিছনে প্রকৃতি আছে। কিন্তু বাঁচাবার পক্ষে যুক্তিও নেই, প্রকৃতিও নেই।

আমরা যাকে বলি প্রাণধারণ করা, বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বলেন, জীবনসংগ্রাম। তাঁদের মতে প্রাণের প্রধান শত্রু প্রাণী। একের পক্ষে বাঁচতে হলে অপরকে মারা দরকার। সুতরাং অপরকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টাটি পাগলামি মাত্র। আপনি যদি এ মতে বিশ্বাস করেন, তা হলে আপনি কোনো জিনিসকে বাঁচিয়ে তোলবার কথা মুখে আনবেন না, নইলে সবুজপত্রের কপালে অকালমৃত্যু এবং অপমৃত্যু একই সঙ্গে দুইই ঘটতে পারে।

ইহলোক যে একটা যুদ্ধক্ষেত্র, একথা আমিও মানি ; কিন্তু আমার মতে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের কোনো ঝগড়া নেই। সংগ্রামটা হচ্ছে আসলে জীবনের সঙ্গে মরণের। সুতরাং নির্বিবাদে বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ও-দুয়ের মধ্যে একটা আপোসে

মীমাংসা করে নেওয়া। অতএব সবুজপত্রকে যদি জীবন্মৃত করতে পারেন, তা হলে তার পরমায়ু অখণ্ড হবে। আধমরা সরস্বতীই যে লক্ষ্মী, একথা তো এদেশে সর্ববাদিসম্মত। ও-পত্রকে নির্জীব করবার জন্য কোনোরূপ আয়াস করতে হবে না, সে আপনিই হবে। কেননা, যাঁর স্পর্শে সবুজপত্র সরস ও সজীব হয়ে উঠেছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ জাপানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন।

বৈশাখ ১৩২৩